ভাবসম্প্রসারণ

স্বল্প পরিসরে গদ্য কিংবা পদ্যবন্ধে প্রকাশিত কোনো বিশিষ্ট ভাবকে মনন-কল্পনা সহযোগে প্রাসঙ্গিক ও বিস্তারিতভাবে শিল্পিত ভাষায় পরিবেশন করাকে 'ভাবসম্প্রসারণ' বলা যেতে পারে। 'ভাবসম্প্রসারণ' এই অর্থে ইংরেজি 'Amplification'-এর বাংলা প্রতিশব্দ। 'ভাবসম্প্রসারণ' কথাটি নিজেই তার নিহিতার্থের আভাস দেয়।

অনেক সময় দেখা যায়, স্রষ্টা তাঁর রচনায় স্বল্প কথায় জীবনের মহৎ উপলব্ধির সংকেত দেন। মহৎ ভাব বা চিন্তা যে আকারে সর্বদা বিরাট হবে, এমন কোনো কথা নেই। বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদের মতো জীবনের অনেক বড়ো ভাবও ছোটো পরিসরে ধরা পড়ে। আবার জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের দার্শনিক উপলব্ধি কখনো-কখনো সামান্য কথায় ব্যক্ত হয়। ইঙ্গিত এবং ব্যঞ্জনাধর্মী এসব মিত-আয়তনের কথাকে সম্প্রসারিত করা ভাবসম্প্রসারণের উদ্দেশ্য।

ভাবসম্প্রসারণ দু-রকম হতে পারে—১ প্রত্যক্ষ, ২ পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মূল ভাবটিকে বর্ণনাধর্মী ভাষায় ব্যক্ত করা হয়; আর পরোক্ষ ভাবসম্প্রসারণে মূল ভাবটি অভিব্যক্ত হয় রূপক, প্রতীক ইত্যাদির আবরণে।

ভাবসম্প্রসারণ করার সময় শিক্ষার্থীর কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

- প্রথমেই প্রদত্ত উদ্ধৃতিটি বারবার পড়ে অন্তর্নিহিত ভাবটি বা সত্যটি বুঝে নেবে।
- পঙ্ক্তিতে কোনো উপমা-প্রতীক-রূপক থাকলে তার অর্থ সঠিক বুঝে নেবে।
- মূল ভাবকে অবলম্বন করে কমবেশি ১৫০ শব্দে উত্তর লিখবে।
- লেখায় যেন ভাবনাচিন্তার পারম্পর্য বজায় থাকে।
- লেখায় যেন রূপক-প্রতীকের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়।
- অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বর্জন করবে। প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ব্যবহার করলে তা খুব সাবধানে প্রয়োগ করবে। সেটি বিষয়ানুগ না হলে পরীক্ষায় মান কাটা যাবে। রচয়িতার নাম জানা থাকলেও লিখবে না।
- মান্য চলিত ভাষায় উত্তর লিখবে।

১ শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির
লিখে রেখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

শৈবালের জন্ম দিঘির বিশাল জলরাশির মধ্যে। দিঘির জলই তাকে পুষ্টি জোগায় এবং বাড়তে সাহায্য করে। দিঘি এর জন্য শৈবালের কাছে কোনো কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করে না। কিন্তু শৈবাল যদি তার গা বেয়ে দিঘির জলে গড়িয়ে পড়া একফোঁটা শিশিরের জন্য গর্ববোধ করে এবং সে কথা দিঘিকে সদম্ভে মনে করিয়ে দেয়— তাহলে একটু অবাক লাগে বই কি!

এই রূপক ঘটনা মানবসংসারে বিচিত্র ঘটনারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অকৃতজ্ঞতা বহু মানুষের স্বভাবে আছে। যেমন কবি বলেছেন, "ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে। ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।" অনুগৃহীত ব্যক্তি অনুগ্রহকারীর দোষকীর্তন করে নিজের মহিমা বাড়াতে চায়। যারা অনুদার ও সংকীর্ণ মানসিকতার মানুষ তারা পরিস্থিতির চাপে পড়ে যদি কখনও কারও উপকার করেও তবে উপকারের মাত্রা যত সামান্যই হোক, তবু সে-কথা উপকৃতকে গর্বভরে জানাতে ভোলে না। শুধু তাই নয়, নীচাশয় ব্যক্তির প্রকৃতি এমনই যে, সে তখন নিজের ঋণের কথা ভুলে গিয়ে নিজের উপকারটিকেই বড়ো করে দেখে এবং তার জন্য পূর্ব-উপকারীর কাছে কৃতজ্ঞতা দাবি করে। নীচ, হীনমতি মানুষ; ওই শৈবাল দলের মতোই যারা মহামহিম স্নেহময় মানুষের কোলে আশ্রয় নেয়—যেমন দিঘিতে শৈবাল এবং শৈবালের মতো তারাই আবার অসার দম্ভও প্রকাশ করতে পারে। সংসারে এমন ঘটনা বিরল নয়।

২ জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

ঈশ্বর এই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রেম, কৃতজ্ঞতা বা সেবাভাবনা মানুষের এক চিরন্তন বোধ। সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে বড়ো প্রকাশ তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই তথা সমগ্র জীবসমাজের মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাই সমগ্র জীবসমাজের প্রতি আদি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে ভালোবাসা তথা সেবা করা সম্ভব।

মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চাইলেও ঈশ্বরসৃষ্ট জীবের প্রতি সে ভালোবাসা প্রদর্শিত হয় না। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ভেদাভেদে বিঘ্নিত হয় সে ভালোবাসা। অসহায় আর্তকে ভুলে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের জন্য মানুষ চালিত হয়। অথচ ঈশ্বর সৃষ্ট এই জীবকুলের প্রতি বর্ষিত হয় তার ঘৃণা, অবজ্ঞা। তাতে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকেই অবজ্ঞা করা হয়। সমস্ত রকম ভেদাভেদ ভুলে জীবকুলের সেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের প্রতি প্রেম নিবেদন সম্ভব। অসহায় আর্তের সেবা, তাদের আপন করে নেওয়া, ধনী-দরিদ্র, জাতপাত প্রভৃতি সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের পাশে দাঁড়ানো ঈশ্বরসেবার নামান্তর। বিভিন্ন পথ ও মতের পার্থক্য থাকলেও মানবতার প্রধান লক্ষ্য এই জীবসেবা তথা মানবকল্যাণ। তাই মানব কল্যাণের মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয় ঈশ্বর কল্যাণ তথা ঈশ্বর প্রেম।

৩ রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

রাজা হলেন প্রজাদের রক্ষাকর্তা। কিন্তু কখনও কখনও লোভের বশবর্তী হয়ে রাজা তাঁর কর্তব্যপালন না করে কাঙালকে রক্ষা করার পরিবর্তে তার ধন চুরি করতে প্রবৃত্ত হন।

নিজেদের কল্যাণের তাগিদেই মানুষ সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সমাজ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের অভিঘাতেই আবার সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে। সমাজে শ্রেণিবৈষম্য দেখা দেয়। অর্থলিপ্সা, বিত্তবাসনা সামাজিক বৈষম্যের মূলে ক্রিয়াশীল। আর্থিক দিক থেকে সমাজ মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত— উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। একটি গোষ্ঠীর হাতে অফুরন্ত অর্থ ও সম্পদ, যদিও তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণির জীবন অর্থসংকটে দুর্বিষহ। বলাবাহুল্য, এই দ্বিতীয় গোষ্ঠী সমাজের বৃহত্তর অংশ। আবার যেহেতু অর্থ-সম্পদের সঙ্গে যুক্ত থাকে ক্ষমতা-শক্তি-প্রতিপত্তি, সেহেতু ধনীরাই সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় উচ্চবিত্ত শ্রেণির দখলে বিপুল সম্পত্তির উৎস শোষণপ্রক্রিয়া। নিম্নবিত্ত দরিদ্র জনগণকে শোষণ ও বঞ্চনা করেই অর্থবানরা তাদের কোশাগারকে যুগ যুগ ধরে স্ফীত করেছে এবং করছে। সাধারণ মানুষের ঘর্মাক্ত শ্রমের উৎপাদনকে লুঠ করে ধনদৌলত ও ক্ষমতা প্রতিপত্তিতে বলীয়ান অর্থলিপ্সু শোষক শ্রেণি ক্রমশ ধনী থেকে আরও ধনী হচ্ছে, দরিদ্র হচ্ছে দরিদ্রতর। সমাজের বৃহত্তর অংশের সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মুষ্টিমেয় ধনীর ভাণ্ডারে, যা মানবতার পক্ষে লজ্জাজনক।

❹ ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

▸▸ ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়। আলোর অন্তরালে যেমন ছায়া থাকে, তেমনি ধ্বনির অন্তরালে থাকে প্রতিধ্বনি। আলো না থাকলে যেমন ছায়ার অস্তিত্ব মিথ্যা, তেমনি ধ্বনি না থাকলে প্রতিধ্বনিও অস্তিত্বহীন।

বাস্তব জীবনে এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটে যা মানুষকে উদ্‌বিগ্ন করে। এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা বড়ো হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের এই প্রতিষ্ঠার মূল উৎসটিকে ভুলে গেছেন। একজন মানুষের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে এক বা একাধিক ব্যক্তির উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা থাকে, থাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান। কিন্তু এটা লক্ষ করা যায় যে, অনেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উপকারীর উপকার ভুলে যান। তাঁরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার পরিবর্তে পূর্বের সমস্ত ঋণ গোপন করার চেষ্টা করেন। এমনকি উপকারীর উপকারের চিহ্নটুকু মুছে ফেলার জন্য আড়ালে তাঁর নিন্দা করতেও দ্বিধা করেন না। উপকারীর উপকার মনে না রাখা দোষের, কিন্তু সেই উপকারীরই অপকার করা বা কৃতঘ্নতা ন্যক্কারজনক। এই কৃতঘ্নতা মানুষের চরিত্রের অন্যতম দোষ।

❺ মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

▸▸ এই পৃথিবী খুবই সুন্দর। সুন্দর এখানকার প্রতিটি বস্তু। তাই এই পৃথিবী ছেড়ে মানুষ মৃত্যুকে বরণ করতে চায় না।

পৃথিবী বৈচিত্র্যময়। বিচিত্র এই পৃথিবী রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে সমৃদ্ধ। নির্মল নীল আকাশ, সোনালি সূর্যালোক, রুপালি চন্দ্রালোক, শ্যামল বনভূমি, নদীর কলতান, তরঙ্গায়িত প্রবহমানা স্রোতস্বিনী, রংবেরঙের ফুল ও প্রজাপতি, ধূসর মরুভূমি, তুষারাবৃত শৃঙ্গ— পৃথিবীব্যাপী এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের মনে আনন্দের সঞ্চার করে। বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণের পর মানুষ পৃথিবীর সৃষ্টির সঙ্গে প্রাণের সূক্ষ্ম সম্পর্ক অনুভব করে। পৃথিবীর সুন্দর রূপ আস্বাদনের পর কখনোই মানুষ এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চায় না। বিদায়ের কথায় মানুষের মন স্বভাবতই ভারাক্রান্ত হয়। তা ছাড়াও মানবমন আবেগ অনুভূতির ভাণ্ডার। স্নেহ, মায়া-মমতা, প্রেম-ভালোবাসা, ভক্তি, দয়া-দাক্ষিণ্য— নানান গুণে সমৃদ্ধ মানুষের হৃদয় পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে গড়ে তোলে হার্দিকসম্পর্ক। অন্তর ও বাইরের মেলবন্ধনে পৃথিবীতে রচনা করে তার নিজস্ব রম্যভূমি। বিধাতাসৃষ্ট বিশ্বপ্রকৃতির এই সৌন্দর্য থেকে মানুষ নিজেকে দূরে নিয়ে যেতে চায় না। মৃত্যু অবধারিত জেনেও মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছা চিরন্তন।

❻ এমন মানবজমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।

▸▸ মানবজীবনকে অবহেলায় নষ্ট না করে, তাকে যথার্থভাবে ব্যবহার করলে তার থেকেও সোনা উৎপাদিত হতে পারে।

এই পৃথিবীর সকল মানুষের পরমায়ু সমান নয়। কেউ দীর্ঘায়ু হন আবার কেউ বা অকালেই চলে যান। মানুষের এই আয়ুষ্কালের ওপর নির্ভর করে মানবজীবনের মূল্যায়ন করা যায় না। জীবনের মূল্য নির্ধারিত হয় মানুষের কাজের ওপর। মানবসভ্যতা আজ যে শীর্ষে উঠেছে তার মূলে আছে বহু মানুষের কল্যাণকামী প্রচেষ্টা। মানুষ তার দীর্ঘ ও স্বল্প জীবনের মধ্যেই বহু কর্ম সাধন করতে পারে। খুব স্বল্পায়ু জীবনের অধিকারীরাও বৃহৎ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীর মঙ্গলসাধন করে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মহান ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আসলে কল্যাণকর্মের মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। কেবল বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে না থেকে প্রত্যেকেরই উচিত কোনো-না-কোনো কর্মের মাধ্যমে জীবনকে সার্থক করে তোলা। তার ফলে জীবন শুধু নিষ্ফল সময় অতিবাহন না হয়ে বৃহত্তর মানবসমাজের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে তার একটা বিশেষ মূল্য তৈরি হয়। মানুষকে মানুষের মতো বাঁচতে হলে সংকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডি অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতে হবে। নিজেকে মেলে ধরতে হবে বৃহৎ জগৎ ও জীবনের মধ্যে। শুধুমাত্র স্বার্থচিন্তা করে মানুষ কখনোই মহৎ জীবনের অধিকারী হতে পারে না। পরহিতের মাধ্যমে মহান মানুষেরা, মানুষের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে মানবতার স্বার্থকে বড়ো করে দেখার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা।

❼ মরার পর অল্প লোকই অমর হইয়া আছেন, সেইজন্য পৃথিবীটা বাসযোগ্য হইয়াছে।

▸▸ মানুষ মরণশীল। জন্মগ্রহণ করলে জীবের মরণ অনিবার্য—এ সত্য অমোঘ। দৈহিক জীবনের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব। ব্যতিক্রমী শুধু কিছু মানুষ, যাঁরা নিজেদের কর্মের মাধ্যমে মানুষের মনোজগতে অমর হয়ে থাকেন, কিন্তু এই অমর মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে খুব কম।

এই পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। যেহেতু সব মানুষ অমর হতে পারে না সেহেতু মানুষ চায় এই ক্ষণিক জীবনাবকাশে মর্ত্যসুধা প্রাণভরে আস্বাদন করে নিতে। পত্র-মর্মর ধ্বনির মধ্যে, শীতল নদীর পরশে, চন্দ্রালোকিত উন্মুক্ত প্রান্তরের শোভায়, মৃদুমন্দ বাতাসের অনুভবে মানুষ নিজেকে বারবার খুঁজে ফেরে। বাবা-মা-সন্তান, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রীর সুন্দর সম্পর্কে বাঁধা পড়ে সম্পর্কের মায়া আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় মানুষ। তাই সম্পর্কসূত্র গভীর হয়, মানুষে-মানুষে রচিত হয় মানববন্ধন। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনের মাঝখানে বেঁচে থেকেই মানুষ লাভ করে পরমানন্দ। মায়ামমতা, স্নেহ-ভালোবাসায় নিজেদের জড়িয়ে মরণশীল মানুষ এভাবেই পৃথিবীকে করে তোলে বাসযোগ্য।

৮ বাহিরে বস্তুর শোভা—ধন বলে তায়,
কল্যাণ সে অন্তরের—পরিপূর্ণতায়।

▶▶ বাহ্যিক শোভা ধন বলে পরিচিত হলেও মানুষের হৃদয়বৃত্তি পরিপূর্ণতায় ভরে ওঠে কল্যাণকর কর্মের মধ্য দিয়ে।

ধনসম্পদ হল জাগতিক ভোগসুখ আরাম-বিলাস ও চাকচিক্য আর বাহ্যিক শোভার উপকরণ। ধনসম্পদের নেশা ও বিলাসের আধিক্য মানুষকে দাম্ভিক করে। পার্থিব ঐশ্বর্য মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, করে স্বার্থপর। ধনসম্পদের প্রাচুর্য মানুষের মনের যুক্তিকে দূরে সরিয়ে রাখে। পার্থিব মানুষের কাছে ধনসম্পদে সৃষ্ট শোভা আপাতভাবে হয়ে ওঠে লোভনীয়। পাশ্চাত্যের দিকে যদি তাকানো যায় তবে দেখা যাবে সেখানে পার্থিব উপকরণের বিপুল সমারোহ, সম্পদের অপরিমেয় প্রাচুর্য। কিন্তু বাইরের শোভার বিচ্ছুরিত ছটা মানুষের অন্তরকে ভরিয়ে দিতে পারছে না। ফলে জীবনের বহু ক্ষেত্রে হতাশা নেমে আসছে। ব্যক্তির মানসিক হতাশা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল কল্যাণকর কর্মে আত্মনিয়োগ। মানুষ মহৎ হয়ে ওঠে তার মানবিকতা প্রকাশের মধ্যে। বাইরের সম্পদশোভায় মগ্ন না হয়ে, আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে পরহিতে জীবন উৎসর্গ পরিপূর্ণ অন্তর তথা হৃদয়ের প্রকাশ। ইতিহাসে দেখা যায় ঐশ্বর্যভোগ, রাজসিক চাকচিক্য, সুখসম্পদের আকর্ষণ ত্যাগ করে বহু মহামানব মানবকল্যাণে অন্তরকে পূর্ণতায় ভরিয়েছেন। তারা সন্ধান পেয়েছেন প্রকৃত সুখের। লাভ করেছেন বিশ্বজনীন শ্রদ্ধা। বস্তুর বাহ্যিক শোভা নয় অন্তরের পরিপূর্ণতার দ্বারা মানবকল্যাণসাধন জীবনকে সার্থক করে তোলে।

৯ অনাহারে মরিবার জন্য পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।

▶▶ মৃত্যু অনিবার্য হলেও অনাহারে মৃত্যুবরণ করার জন্য পৃথিবীতে কেউ জন্মগ্রহণ করে না।

সুন্দর এই পৃথিবীর আলো, জল, বায়ুর ওপর যেমন সমস্ত মানুষের সমান অধিকার আছে, তেমনি সেখানকার অন্নের প্রতিও সকলের সমানাধিকার বর্তমান। বর্তমান সভ্যতায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও দারিদ্র্য বহু দেশের বহু মানুষের নিত্যসঙ্গী। আজও অনেক মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। অসহায় সম্বলহীন মানুষের জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ অনুসন্ধানেও দেখা যায় একটা বড়ো প্রশ্ন। একদিকে মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে দেখা যায় কলকারখানায়, ব্যাবসাবাণিজ্যে, কৃষিতে প্রভূত উন্নতি, অপরদিকে ঠিক এর বিপরীত চিত্র— অনাহারে মৃত্যু। এসবের প্রেক্ষাপটে রয়েছে সম্পদের বৈষম্য, মানবতাবোধ বা মূল্যবোধের অভাব। সমাজসংস্কারক সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন ধনসম্পদের বিষম বণ্টনের কারণেই সাধারণ মানুষের এই দুর্গতি। সমাজের কতিপয় মানুষ সমস্ত ক্ষমতা ও সম্পদ নিজেদের কাছে কুক্ষিগত করে বেশিরভাগ মানুষকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এরকম বৈষম্যময় অবস্থার অবসান ঘটতে পারে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। আর এভাবেই সুন্দর পৃথিবী সুন্দরভাবে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

১০ হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও, গোপনে গোপনে।

▶▶ অতীত সর্বদা নিভৃতে বর্তমান ও আগামীর উপর তার প্রভাব সঞ্চার করে।

গীতার প্রধান উপদেশ কর্মযোগ। প্রকৃত কাজের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব অস্তিত্ব বিকশিত হয়। আমরা জানি কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। মানুষ সাধারণত অতীতচারী। অতীতের ঐতিহ্য, কর্মকাণ্ড প্রচার করে তারা আত্মসুখ লাভ করে। অতীত ইতিহাস থেকে আমরা প্রেরণা পাই। ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য, অতীতের নানা কাহিনি থেকে আমরা নানাভাবে উৎসাহিত হই। মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগ, সেবা, সুভাষচন্দ্রের বীরত্ব আমাদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করে। কর্মী যারা, যারা দেশ, জাতি সমাজের উন্নয়নে ও সার্বিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেন, এমনকি আত্মাহুতি দিতেও পিছপা হন না, যেমন— ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা, মাতঙ্গিনী— তাঁরাই আমাদের অনুপ্রেরণা জোগান। ভারতীয় পুরাণ, সাহিত্য, মহাকাব্যে মানবিক গুণাবলির অজস্র নজির আছে। তাই কাজ করার সময় ইতিহাস থেকে, অতীত থেকে রসদ সংগ্রহ করে, বিনা বাক্যব্যয়ে কাজ করে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। সময় স্রোতের মতো বয়ে চলে তাই কালক্ষেপ না করে কাজ করে যাওয়া উচিত। কাজের সময় কোনো প্রচারের মানসিকতা থাকলে চলবে না।

১১ যে শুইয়া থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে।

▶▶ আলস্য, শ্রমবিমুখতা ভাগ্যগঠনের পরিপন্থী। তাই শুয়েবসে দিন কাটালে জীবনচক্রও গতিরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

সমাজে 'পরিশ্রম'কে সূচক ধরলে দু-ধরনের মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণির মানুষ নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, কর্ম-পরিশ্রমের দ্বারা জীবনে প্রতিষ্ঠা পায়; আর একধরনের মানুষ আছে, যারা শ্রমবিমুখ অলস জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে ভাগ্যের জোরে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লোভে থাকে অপেক্ষমান। শ্রমের পথে, কর্মের পথেই শ্রমজীবী মানুষ ভাগ্য নির্মাণ করে, ভাগ্যকে জয় করে। অথচ পৃথিবীতে দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষের সংখ্যা সুবিপুল। তাই শ্রমবিহীন অলীক ভাগ্যনির্ভরতায় তারা সমস্ত কর্মশক্তিকে জলাঞ্জলি দেয়। একধরনের পরজীবী হয়েই তারা বাঁচতে চায়। তাদের এই পরমুখাপেক্ষিতা মারাত্মক ব্যাধিতে পরিণত হয়। শেষপর্যন্ত তারা অপরের কাছে হয়ে ওঠে বোঝাস্বরূপ। অন্যদিকে কর্মশক্তিও নষ্ট হওয়ায় তাদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। শ্রমবিমুখ, অনায়াস জীবন তাই গতিময়, আনন্দময় হতে পারে না। আর তখনই জীবনের স্বাদ হয় তিক্ত। ভাগ্যও হয়ে পড়ে বিড়ম্বিত। 'গীতা'-র বাণীতেও বলা আছে, কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্তিমানের মধ্যেই ভগবান বিরাজ করেন। তবে কর্মের আগেও ভাবনা বা কল্পনাবিলাসের গুরুত্ব থাকে; কিন্তু কল্পনা করা আর নিদ্রালোলুপ নিশ্চেষ্টতা এক হতে পারে না। কল্পনা বা ভাবনাও মানসিক শ্রম, অন্যদিকে অলস শয়নে ভাগ্যেরই সমাধি রচিত হয়।

১২ পায়ের তলার ধুলা, সেও কেউ যদি পদাঘাত করে।
নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি তার শিরোপরে।

▶▶ বিশ্বসংসার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্টি। জগতের সবকিছুই স্রষ্টা যথাযোগ্য স্থানে রেখেছেন। জড় থেকে জীব —সকলের নিজস্ব মর্যাদা আছে। পথের ধুলা জড়বস্তু, সে পায়ের তলায় থাকে। এই ধূলিকণার মর্যাদা ও সম্মান অনেকে করে না। এমনকি পদাঘাত করে তাকে বুঝিয়ে দেয় সে কত নিকৃষ্ট, ঘৃণ্য ও তুচ্ছ। ধুলোও তার প্রতিশোধ নেয়। সব অপমানের প্রতিশোধ নিতে সেই তুচ্ছ ধুলো অপমানকারীর মাথায় চড়ে বসে। সে বুঝিয়ে দেয় বিধাতার সৃষ্ট কোনো বস্তুই নগণ্য বা নিকৃষ্ট নয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় গৌরবের সঙ্গে বিরাজমান।

মানবসমাজ বড়োই বিচিত্র। এই সংসারে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা কোনো-না-কোনো অজুহাতে অন্যকে নিকৃষ্ট মনে করে অসম্মানিত করে। প্রতি মুহূর্তে তাদের অমর্যাদা করে বুঝিয়ে দেয় যে, তারা তাদের পায়ের তলায় থাকার যোগ্য। শুধু তাই নয় অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে এরা আনন্দ পায়। কিন্তু জগৎসংসারে সব কিছুই চাকার মতো আবর্তিত হয়। ফলে আজ যে ক্ষমতাবান ধনী

কাল সে দুর্বল নির্ধন হতেই পারে। এ ছাড়া যারা যুগ যুগ ধরে অবহেলা পেয়ে চলেছে তারা যদি সংঘবদ্ধ হয়, আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে রুখে দাঁড়ায়, তাহলে নিমেষে অত্যাচারীর মাথা পথের ধুলায় লুটিয়ে পড়বে। নিপীড়িত মানবাত্মার জাগরণ আসলে গণদেবতার জাগরণ। সুতরাং প্রত্যেককেই মনে রাখতে হবে আমরা সবাই পরমপিতার সন্তান। আমরা সবাই সমান। কেউ ছোটো নয়, অস্পৃশ্য নয়, ঘৃণ্য বা নিকৃষ্ট নয়। কেউ অন্যের মর্যাদা নষ্ট করলে পরিণামে তাকেই অপমানিত হয়ে ফিরতে হবে। কারণ স্রষ্টার বিধানে উৎপীড়কের পতন অনিবার্য। নইলে মানবসমাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

১৩ কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা—
কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা।।

▶ অসার আভিজাত্য-গর্ব বৈষম্যের জন্ম দেয়, বাড়িয়ে তোলে ভেদাভেদ। কেরোসিন শিখা তার ক্ষুদ্র অহংবোধে চায় না মাটির প্রদীপের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে। বরং মাটির প্রদীপ 'ভাই' বলে সম্বোধন করলে কেরোসিন শিখা তাকে ভর্ৎসনা করেন। এ সময় আকাশে চাঁদ দেখা দিলে কেরোসিন শিখা তাকে আগ বাড়িয়ে 'দাদা' বলে সম্বোধন করে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসে।

মানবসমাজে বহু মানুষের মধ্যে দেখা যায় আভিজাত্য-গর্ব ও সমাজের তথাকথিত উঁচুতলার প্রতি স্তাবকতার মনোবৃত্তি। তারা সাধারণ সমাজের তথাকথিত নীচুতলার মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চায়। তারা চায় অর্থ, প্রতিপত্তি, কৌলিন্যে সমৃদ্ধ মানুষের সঙ্গ। যদিও শাস্ত্রমতে গুণবান পরজনের থেকে গুণহীন স্বজনই শ্রেয়। এই আপ্তবাক্য ভুলে গেলে মানুষ বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসীর মতো হয়ে উঠবে। ময়ূর পুচ্ছধারী কাকের মতো সে না পারবে তখন ময়ূরের দলে উন্নীত হতে, না পারবে কাকের সমাজে পুনর্বাসন। এভাবে ভ্রান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠবে। বর্তমান সমাজে এমন উদাহরণ অজস্র। মানুষ উঁচুতলার মানুষদের সঙ্গ, তাদের দাক্ষিণ্যের ছিটেফোঁটা পেলেই নিজেদের ধন্য মনে করে। এজন্য নিজেদের আত্মমর্যাদা পর্যন্ত বিকিয়ে দেয়। এসব মানুষ নিজের সমাজে ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে। সম্মান পায় না উঁচুতলার মানুষদের কাছে। তাই এই মানসিকতা অবশ্য পরিত্যাজ্য।

১৪ আলো বলে, 'অন্ধকার, তুমি বড় কালো।'
অন্ধকার বলে, 'ভাই, তাই তুমি আলো।'

▶ আলো এবং অন্ধকারের বৈশিষ্ট্যে বৈপরীত্য দেখা যায়। অন্ধকারের স্বকীয় ধর্ম কালো। এই কারণেই আলোর ঔজ্জ্বল্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

বৈচিত্র্যই হল সৃষ্টির মূল কথা। তাই মহৎ সতত শিরোধার্য হলেও তার উলটো দিকটা সর্বদা পরিত্যাজ্য নয়। কারণ, কুৎসিত কদাচারকে মনে রেখে তার থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টাই মানবধর্ম। এই জগৎ যেন এক রঙ্গশালা। তাই সুখের সঙ্গেই দেখা মেলে অসুখের। শান্ত-স্নিগ্ধ মানুষের সঙ্গে অশান্ত-হৃদয় মানুষও সুলভ। দয়াবান মানব যেমন মানুষের সঙ্গে অশান্ত-হৃদয় মানুষও সুলভ। দয়াবান মানব যেমন হৃদয়কে ভরিয়ে দেয়। তেমনি নির্দয় পশুতুল্য মানুষদের দেখা যায়, যাদের মনপ্রাণ দিয়ে আমরা ঘৃণা করি। এখন কথা হল, গুরুজনদের কাছে আমরা সৎ-সুন্দর ও শুভ হবার শিক্ষা পাই ও উত্তরপুরুষকে সেই শিক্ষা দিই। যা কিছু অসুন্দর ও অকল্যাণকর, তাই আমাদের কাছে ঘৃণিত ও পরিত্যাজ্য। যুগযুগান্তর ধরে মানবসমাজ এই ধারণা নিয়েই চরৈবেতি মন্ত্রে এগিয়ে চলেছে। তবে, অসুন্দর ও অশুভকে আমরা জীবনে যোজনা করব না ঠিকই কিন্তু তাকে বিস্মৃতও হব না। বরং যাবতীয় ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতাকে মনে রেখে আমরা তার থেকে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করব। একটি ছোটো দাগকে না মুছে তার পাশে একটি বড়ো দাগ টানলে যেমন ছোটো দাগটির ছোটো আকৃতি স্পষ্ট হয়, ব্যাপারটা ঠিক তেমনি। সেইভাবেই 'কালো'র নরক থেকে 'আলো'র স্বর্গে আমাদের উত্তরণ ঘটবে। আমরা যথার্থ 'মানুষ' হয়ে উঠব।

১৫ আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছু আলো।

▶ ধূপ নিজে আগুনে পুড়ে অন্যদের সুগন্ধ বিতরণ করে। একইভাবে প্রদীপ নিজে জ্বলে চারিদিকের অন্ধকার দূর করে কাঙ্ক্ষিত আলো নিয়ে আসে।

বিনা কষ্টে, অনায়াসে আরাধ্য বস্তু বা লক্ষ্যকে অর্জন করা যায় না। ধূপ বা দীপের মতো আত্মোৎসর্গের দ্বারাই মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়। সামাজিক জীব হিসেবে প্রত্যেক মানুষকেই কিছু না কিছু কাজ করতে হয়। কর্মহীন জীবন বিড়ম্বনার নামান্তর। অলস, কর্মবিমুখ মানুষকে কেউই সুনজরে দেখে না। মানুষ যদি বুদ্ধি ও কর্ম করার ক্ষমতাকে কাজে লাগায় তা হলে সে মানবসমাজে সহজেই নিজের স্থান করে নিতে পারে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। নিজেদের প্রয়োজনেই মানুষ দলবদ্ধ হয়েছিল। তাই মানুষকে পরস্পরের প্রয়োজনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তবেই প্রতিটি ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ সুন্দর হয়ে উঠবে। মানুষ কেবল আত্মস্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকলে হবে না। বরং আপন হতে বাইরে এসে বিশ্বমাঝে সর্বজনীন স্বার্থে আত্মোৎসর্গ করতে হবে। তবেই ব্যক্তি ও সমাজের সার্থক বিকাশ সম্ভব হবে।

১৬ ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?
প্রলয় নূতন সৃজন বেদন
আসছে নবীন জীবনহারা
অসুন্দরকে করতে ছেদন।

▶ ভয়ঙ্কর প্রলয়ের রুদ্রমূর্তিতে যে ধ্বংস সাধিত হয়, তার মধ্যেই নতুন সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে থাকে। তাই ধ্বংস দেখে ভীত হলে চলবে না।

ধ্বংস ও সৃষ্টি একটি মুদ্রারই এপিঠ-ওপিঠ। সভ্যতার আবশ্যিক ধর্ম এই ভাঙাগড়া। সমাজের সমস্ত ভালোমন্দেরও ভাঙাগড়া চলতেই থাকে। সবচেয়ে বড়ো কথা ঈশ্বরের এই বিরাট সৃষ্টিতে মানুষই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানুষ তার বুদ্ধি ও পরিশ্রম দিয়ে পৃথিবীকে প্রতিনিয়ত সাজিয়ে তুলছে। প্রাকৃতিক কারণে ধ্বংস, মানুষের দ্বারা ধ্বংস— যাই হোক-না-কেন— তা ধ্বংসই। ধ্বংসের পরেই মানুষ আবার নতুন করে সৃষ্টি করতে থাকে। এতে অনেক বাধাবিঘ্ন আসে। তাই বলে তো থেমে থাকা যায় না। এগিয়ে যেতে হবে। যত কঠিন বাধাই আসুক না কেন নতুনকে আহ্বান জানাতে ভয় পেয়ে ঘরের কোণে বসে থাকলে চলবে না। পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে না থেকে নবীনের উচ্ছ্বাসকে কাজে লাগিয়ে পুরাতন অভিজ্ঞতা ও নতুনের হৃদয়াবেগ দিয়ে পুনরায় সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠতে হবে। পৃথিবীকে আবার সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হবে সব ভালো দিয়ে। এই পরিবর্তনশীল জগতে সুখ বা দুঃখ কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। সুতরাং ধ্বংস বা দুঃখের কাছে আত্মসমর্পণ না করে সৃষ্টিমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সুতরাং আত্মশক্তির উদ্বোধনে ভয়কে সরিয়ে ফেলতে হবে।

১৭ যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

▶▶ যাদের তুমি নীচে ফেল তারা তোমাকে নীচে বাঁধবে, যাদের তুমি পেছনে ফেলে রেখেছ তারা ক্রমাগত পেছনে টানছে।

বিশ্বে মানবজাতির আবির্ভাবলগ্নে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। সম্ভবত জাতি বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন শুরু হবার পর আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ প্রথম শারীরিক সক্ষমতার বিভেদ অনুসারে একে অপরের সঙ্গে ভেদবুদ্ধিকে প্রাধান্য দেয়। পরবর্তীকালে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বেড়েছে বই কমেনি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ বা সম্পদ—এমন কতই না বিভেদের রকমফের, প্রতিনিয়ত এই নানান বৈষম্য ও তদনুযায়ী পারস্পরিক সম্পর্কের অবক্ষয় মানবজাতিকে এক অতল নিমজ্জনের দিকে নিয়ে চলেছে। এ কথা ভুললে চলবে না যে পৃথিবীর সকল মানুষের সার্বিক বিকাশসাধন ভিন্ন উন্নত মানবজীবনচর্যা সম্ভবপর নয়। কথাটি বিশ্ব থেকে সংকুচিত করে দেশ, রাজ্য, জেলা, এমনকি পাড়া এবং পরিবার সম্পর্কেও প্রযোজ্য। পরিবারের সকল সদস্য ভালো না থাকলে যেমন সেই পরিবারটি সম্পূর্ণতা পায় না তেমনি একটি জেলা বিকশিত না হলে সমগ্র রাজ্য তথা দেশের বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য। পিছিয়ে থাকা মানুষকে যদি এগিয়ে দেওয়া না যায় তাহলে তার পশ্চাদবর্তিতা শেষপর্যন্ত সামগ্রিক পশ্চাদপরতাকে ত্বরান্বিত করবে।

১৮ বিরাম কাজেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথা।
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।

▶▶ বিরাম, বিশ্রাম বা অবকাশকে শ্রমের অপচয় বলা অনুচিত। বিশ্রামের মধ্য দিয়ে শরীর মনের ক্লান্তি দূর হয়ে নতুন উদ্যমে কর্ম করার জন্য শরীর প্রস্তুত হয়। যেমন, চোখের পাতাও অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ নয়। চোখের পাতা চোখকে বিশ্রাম দেয়; যার কারণে চোখ সুস্থ থাকে।

অনেকে বিরাম বা বিশ্রামকে কাজের অপচয় বলে মনে করেন। তাদের ধারণা বিশ্রাম বৃথা কালক্ষেপ। কিন্তু মানুষ একটানা পরিশ্রম করে যেতে পারে না। অবিরাম কাজ করতে করতে মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, কারণ কাজ করাকালীন মানুষের শক্তিক্ষয় হয়। তাই শরীরে নতুন শক্তি ও উদ্যম জোগান দেয় বিশ্রাম। একটানা কাজ করে কোনো মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে কাজ করতে পারে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশ্রাম নিয়ে সেই নির্ধারিত সময়ে অপর ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক কাজ করতে সক্ষম হয়। তাই বিরাম বা বিশ্রাম কখনোই শ্রমের অপচয় নয়, তা কর্মেরই অঙ্গ বা অংশ। অপরদিকে নয়ন বা চোখও একটানা দেখতে সক্ষম নয়, তাকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন। ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নিলে চোখ আবার নব উদ্যমে দেখতে সক্ষম হয়। তাই চোখের পাতা দেহের অপ্রয়োজনীয় অংশ নয়। চক্ষুপল্লব না থাকলে মানুষ দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারে, কারণ অবকাশ বা বিশ্রাম ব্যতীত কোনো অঙ্গই কর্মক্ষম থাকতে পারে না। যন্ত্রের যেমন বিশ্রাম প্রয়োজন তেমনি মানুষেরও বিশ্রাম প্রয়োজন। তাই বিরাম ও কাজ এবং চোখ ও চোখের পল্লব একে অপরের পরিপূরক।

১৯ আমরা তো জানি না ভয়
মরণ কিংবা পরাজয়
আমাদের এ জীবন
কেবল জয়ের ইতিহাস।

▶▶ মানবজীবন কোনো ভয়, মরণ কিংবা পরাজয় জানে না। মানবজীবন কেবলই জয়ের ইতিহাস।

পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে মানুষ লড়াই করে বাঁচছে। প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি মানুষকে পদে পদে বিপদে ফেলত। তারপর ধীরে ধীরে মানুষ বাস্তবের সম্মুখীন হতে শিখেছে। ভয়কে জয় করতে হবে জেনে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। আসলে নিজের শক্তিতে আস্থা অর্জন করতে না পারলে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। ব্যক্তির মধ্যে ভয়কে দূর করার ক্ষমতা গড়ে উঠতে পারবে না। দৃঢ়চেতা আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিই পারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে। মানবজাতির ইতিহাস বহু উত্থান-পতনের ইতিহাস; কখনও জয়ের কখনও পরাজয়ের। কিন্তু পরাজয়ের মধ্যে থেমে থাকা যায় না। বরং পরাজয় থেকে মানুষ শিক্ষা নিতে পারে। জীবনের উদ্দেশ্য তাই ভয়, মৃত্যু ও পরাজয়কে দূরে সরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আসলে সঙ্কোচ, ভয়, লজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। এর জন্য দরকার কঠোর অধ্যবসায় এবং মনঃসংযোগ।

২০ আমরা চলি সমুখপানে
কে আমাদের বাঁধবে।
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।

▶▶ আমরা যখন সামনের দিকে এগিয়ে চলি তখন কেউ আমাদের উদ্যমকে বেঁধে রাখতে পারে না। যারা পিছনের টানে পড়ে থাকে তারাই কেবল কাঁদে।

বৈদিক ঋষিদের কণ্ঠে ধ্বনিত মন্ত্র 'চরৈবেতি' হল মানবজীবনের এক মহামন্ত্র। জীবনের ধর্ম হল এগিয়ে চলা অর্থাৎ গতিশীলতা আর মৃত্যুর ধর্ম থেমে যাওয়া। কালের নিয়মে সমাজে পরিবর্তন আসে। আত্মশক্তিতে বলীয়ান, আদর্শের প্রতীক তরুণবাহিনী নতুন সমাজকে বরণ করতে এগিয়ে যায়। নির্ভীক যুবকেরা অতীতের তুচ্ছতা, জীর্ণতা, গ্লানি মুছে আগামীর যাত্রী হতে চায়। তারা জানে সে পথে পাথরকঠিন সংস্কারের বাধা। কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতাই তাদের কর্মশক্তি, আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণায় বলীয়ান করে তোলে। পুরাতনের অনুকরণ তাদের কাছে অসহনীয়। সমাজে নতুন জীবনসত্যকে তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এর পাশে আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী, সংস্কারের বেড়াজালে বদ্ধ পুরাতনপন্থীরা নিজেরাই নিজেদের জীবনযুদ্ধের প্রতিবন্ধক। অকারণ ভয়ে দিনযাপনের কারণে জীবনকালেই তাদের মৃত্যু হয়। পুরাতন জরা, অবসাদে তারা পথ হারিয়ে ফেলে। জীর্ণ লোকাচার তাদের চলার প্রতি পদক্ষেপকেই রুদ্ধ করে দেয়।

পিছুটান সমাজের গতি স্তব্ধ করে। অনুন্নয়নের চোরাবালিতে সে ডুবে যায়। তখন সেই সমুখপানে ছোটা দলই সমৃদ্ধ করে তার সমাজকে।

২১ প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক ধিক বলে তারে কাননে সবাই;
সূর্য উঠি বলে তারে, ভালো আছো ভাই ?

▶▶ প্রাচীরের গায়ে নামগোত্রহীন ক্ষুদ্র ফুলকে বাগানের অভিজাত ফুলেরা ধিক্কার জানালেও, উদার সূর্যের প্রভাত সম্ভাষণ তার পুষ্পজীবনকে ধন্য করে।

মানবসমাজেও আমরা দুই শ্রেণির লোক দেখি— একদল মানুষ নিজেদের আভিজাত্য ও অহংকারের বশে সাধারণ দীনদরিদ্র মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করে না। আমাদের সমাজে সাধারণ মানুষের সংখ্যাই অধিক, তারা নাম না জানা ফুলের মতোই অখ্যাত ও অনাদৃত। কিন্তু এই সংসারে সূর্যের মতো মহৎ, উদারমনস্ক মানুষেরা ধন-মান-আভিজাত্যের

মাপকাঠিতে মানুষকে বিচার করেন না। সকল ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে তারা মানুষকে ভালোবাসেন। উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র সকলেই তাদের কাছে সমান। সকল মানুষকে যারা আপন করে নিতে পারেন তারাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী। এদের ভালোবাসা সূর্যের কিরণের মতো সকলের ওপর বর্ষিত হয়। নীচতা বা সংকীর্ণতা থেকে মুক্তমনের অধিকারী এই সমস্ত মহৎ মানুষের কাছে কেউই উপেক্ষার পাত্র বা অবহেলিত নয়। ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণচেতা ব্যক্তি ঐশ্বর্য, আভিজাত্যের মোহে দীন-দরিদ্র, স্বজন-পরিজনকে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু উদারচেতা, মহান, সমদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের চোখে কোনো বৈষম্য থাকে না।

২২ কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।
তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।

▶▶ হীরক অর্থাৎ হিরা খুবই মূল্যবান বস্তু, কিন্তু তা সাধারণত আকৃতিতে খুবই ক্ষুদ্র এবং খুবই দুষ্প্রাপ্য জিনিস। তাই কোনো এক বিরাটাকার হিরার প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে আমরা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠি। আমরা সেটিকে যাচাই করার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠি এবং যাচাই করলেই প্রতিভাত হয় যে সেই বিরাটাকার হিরাটি মোটেই খাঁটি নয়, নকল হিরা।

এই রকম নকল হিরার মতো মানুষও আমাদের মনুষ্য সমাজে কম নেই। তাদের আচরণে যে ধরনের কপটতা, নীচতা তথা আন্তরিকতার অভাব থাকে, তাতেই তাদের চরিত্র সহজেই মনুষ্যসমাজে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। এইসব চরিত্রের অধিকারী মানুষেরা নিজেরা নিজেদের গুণের বড়াই করে আত্মপ্রচার করে বেড়ায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের বড়ো দেখানোর চেষ্টায় মত্ত থাকে। অন্তরের দীনতাকে বাহ্যাড়ম্বরে গোপন রাখতে চায়। কিন্তু যিনি প্রকৃত জ্ঞানী ও গুণী, তিনি কখনোই ঢাকঢোল পিটিয়ে আত্মমহিমা জাহির করেন না। মহান ব্যক্তির মহত্ত্ব সুপ্ত অগ্নির মতো, নিজস্ব উত্তাপেই তার পরিচয় ফুটে ওঠে। মহৎ মানুষের চরিত্রমাধুর্য সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে। নিরাভরণ মনুষ্যত্বের মহিমাতেই তার পরিচয়। কিন্তু নকল হীরার মতো মানুষের বাগাড়ম্বর এবং আত্মপ্রচারের বহরই তার খাঁটিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। জনশ্রুতি আছে যে, শূন্য কলসির আওয়াজ বেশি। অন্তঃসারশূন্য নকল মানুষের প্রগলভতাই তার চরিত্রের কপটতাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়।

২৩ ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

▶▶ নান্দনিকতাবোধ, সাহিত্যচর্চা, কল্পনাবিলাস ইত্যাদি হল মানসিক ক্রিয়াকলাপ। জঠরে যখন ক্ষুধার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় তখন সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো মানসিক অবস্থা থাকে না।

ক্ষুধার্ত মানুষের কল্পনাবিলাসের থেকে রুটির প্রয়োজনই বেশি। মানুষ সৌন্দর্যের পূজারি। মানুষের চারপাশে প্রকৃতি বিচিত্র সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে রেখেছে। পূর্ণিমার আলোকিত চাঁদ চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রতীক। কিন্তু সমাজব্যবস্থায়, জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত মানুষ অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে দিশাহারা, বিপর্যস্ত। বঞ্চনা, শোষণ ও অসাম্যের ফলে তার অন্নসংস্থান কঠিন হয়ে পড়েছে। সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মানসিকতা তার আর তখন থাকে না, পরিবর্তে ক্ষুধার অন্নসংস্থান তার জীবন-মরণের বিষয়ে পরিণত হয়। এই কারণেই জঠর জ্বালায় জর্জরিত মানুষের কাছে পূর্ণিমার চাঁদ সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে দেখা দেয় না, চাঁদকে মনে হয় ঝলসানো রুটি। অভিজ্ঞতার কাঠিন্যে রূপ-রস-গন্ধসমৃদ্ধ প্রকৃতি তার কাছে নীরস, বর্ণহীন। পদ্যের লালিত্যের পরিবর্তে গদ্যের বাস্তবতা দিয়ে মানুষ জগৎকে দেখতে, জানতে সে বাধ্য হয়।

২৪ উচ্চ বংশে জন্ম দৈবাধীন, কিন্তু পৌরুষ নিজের আয়ত্তে।

▶▶ জন্ম ও মৃত্যু মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু এই দুটি ঘটনা কোনো মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। বিশেষ করে জন্ম সম্পূর্ণ দৈবাধীন। তবে জীবনে আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত নয়। জীবনে মনুষ্যত্ব ও পৌরুষত্ব অর্জন সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে। এজন্যে প্রয়োজন আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, অনুশীলন, অধ্যবসায় ও কৃচ্ছ্রসাধন।

কথাতেই আছে, যারা পরিশ্রম করে, তারা সাফল্য লাভ করে। মানুষ আপনার ঘর আপনি নির্মাণ করে। পরিশ্রমীরাই সাফল্যের শিখরে আরোহণ করে জীবনে পরম সুখ ও শান্তি ভোগ করে। মানুষের জন্ম যেখানেই হোক, কর্ম হোক ভালো। মহাভারতে কর্ণ সূতপুত্র হয়েও মহান যোদ্ধা ও দাতার সম্মান লাভ করেছিলেন। ধীবরপুত্র ব্যাসদেব মহাভারতের প্রণেতা, শতদল পাঁকে জন্মালেও দেবীর চরণে নিবেদিত হয়ে জীবনে কৃতার্থ হয়। দলিত, দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা কারোর কাছে দুঃখের বা দোষের ব্যাপার নয়। মানুষের বংশ পরিচয় তার প্রকৃত পরিচায়ক নয়। মানবধর্ম তার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। যে মানুষ চিন্তায়, মেধায় কর্মে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে সে যে বংশেই জন্মাক, তার কৃতিত্ব বরণীয়। পথের কুকুরও প্রশিক্ষণের গুণে গৃহপালিতের আদবকায়দা রপ্ত করতে পারে। ঠিক তেমনি মানুষ দৈবাধীনে যেখানেই আবির্ভূত হোক, নিজ প্রচেষ্টায় পুরুষত্ব এবং অসাধারণত্ব অর্জন করতে পারে। পক্ষান্তরে কর্মদোষে মানুষই আবার কাপুরুষ বা হীনচেতা প্রাণীতে পরিণত হয়।

২৫ অন্যায় যে করে আর
অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

▶▶ মানুষের ন্যায়বোধের দ্বারা চালিত হয় পৃথিবীর ন্যায়ধর্ম। আবার মানুষের হাতেই বিনষ্টিসাধন ঘটে এর। পরস্পরবিরোধী কথা হলেও এটাই বাস্তব। মানবসমাজের কল্যাণের জন্য ন্যায়নীতির অস্তিত্ব এবং তা রক্ষা করার দায়িত্বও মানুষের। যখন সেই নীতির অস্তিত্ব লঙ্ঘিত হয় তখন জন্ম হয় অপরাধের।

যে মানুষ অন্যায় করে সে অপরাধী। কিন্তু যারা ন্যায়ের অপমান দেখেও চুপ করে থাকে সমান অপরাধী তারাও। পৃথিবীর এক শ্রেণির মানুষ নিজের ক্ষমতার স্বার্থে, লোভের বশবর্তী হয়ে সমাজের ন্যায়নীতিকে পরোয়া না করে একের পর এক অন্যায় করে চলেন। কিন্তু তাকে যদি বাধা না দেওয়া হয়, বা প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহলে সেই অন্যায়ের মাত্রা বেড়ে যাবে ভয়ংকরভাবে এবং সমাজের চরম অমঙ্গল ছাড়া আর কিছুই সাধিত হবে না। এই দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা দরকার সামাজিক স্বার্থে; কারণ প্রতিবাদকারীও সামাজিক মানুষ। কিন্তু চুপ করে অন্যায় সহ্য করলে অন্যায়কারীর সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়কেও প্রশ্রয় দেওয়া হবে। ভয়ে, ভক্তিতে বা উদাসীনতায় যারা অন্যায়কারীকে সমর্থন করে তারাও সমান দোষী। তাই অন্যায়কারী একা নয় অন্যায়ের সমর্থনকারীরও দণ্ডিত হওয়া উচিত। আমাদের কাছে তারা দুপক্ষই হবে সমান ঘৃণার পাত্র।

২৬ স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে
সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

▶▶ স্বার্থপরের মতো নয়, বরং নিঃস্বার্থভাবে সকলের সুখ-দুঃখে শামিল হওয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে জীবনে বাঁচার প্রকৃত তাৎপর্য। স্বার্থমগ্ন ব্যক্তি কখনও জগতে বেঁচে থাকার শিক্ষা পায়নি।

ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে যে ব্যক্তি মরিয়া, সে বৃহৎ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বৃহৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নিজ সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ভোগবিলাসের মধ্যে বাঁচাকে প্রকৃত বাঁচা বলে না। মানুষের মতো বাঁচতে হলে তাকে তার কর্তব্যকর্ম, দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়। মানুষ যদি কেবল আত্মসুখে মগ্ন থাকে, তবে সংকীর্ণভাবের পরিচয় মেলে। এই সংকীর্ণ স্বার্থপরতা মানবজীবনকে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ করে। মানুষের উচিত বৃহৎ জগতের মধ্যে একাত্ম হয়ে বাঁচা। মানবিক গুণাবলি প্রকাশের মধ্য দিয়েই মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক এবং উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছে। অপরের হিতসাধনে শামিল হতে পারার মধ্যে রয়েছে এক অনাবিল আনন্দ ও প্রশান্তি। তাই সংকীর্ণ স্বার্থের পথকে ত্যাগ করে উদার মানবিক হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে বাঁচার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত বাঁচার আনন্দ ও সার্থকতা।

২৭ সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।

▶▶ সুসময় এবং অসময় মানবসমাজের নানা দিককে চিহ্নিত করে দেয়। মানুষের চরিত্র উদ্‌ঘাটনে সময় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মানুষের সময় যখন ভালো থাকে তখন সাঙ্গোপাঙ্গরা ভিড় জমায়। কিন্তু সেই মানুষটিরই সময় যখন খারাপ হয় তখন কোনো বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের দেখা পাওয়া যায় না। প্রকৃত বন্ধু হয় তারাই যারা উৎসবে, বিপদে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, বিচারালয়ে এমনকি শ্মশানেও উপস্থিত থাকে।

সচরাচর দেখা যায় সুদিন বা সুসময় এলেই বন্ধুরা উপস্থিত হয় কিন্তু দুর্দিনে তাদের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। অথচ বিপদের দিনে সঙ্গে থাকা সুজনই তো প্রকৃত বন্ধু। মানুষের দেওয়ার দিন যখন থাকে তখন তা গ্রহণ করার মতো বহু বন্ধুই উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি যখন অভাবে পড়ে তখন তার পাশে কাউকেই পাওয়া যায় না। এই শ্রেণির সুখের বন্ধুকে বসন্তের কোকিলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বসন্তকে সুখের ঋতু বলা হয়, সেই সময় কোকিলের আগমন ঘটে কিন্তু শীত-বর্ষা—এইসব ঋতুর কষ্টকর সময়ে কোকিলের দেখা মেলে না। তাই মানুষের প্রকৃত বন্ধু বা মিত্র কে তা সহজেই নির্ণীত হয় মানুষের দুঃখের দিনে। দুঃখের দিনে সঙ্গীদের কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

২৮ 'কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যা রবি'
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি,
মাটির প্রদীপ ছিল সে কহিল, 'স্বামী
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

▶▶ সারাদিন আলো ও তাপ বিকিরণের পর সূর্য বিদায় নেয়। পৃথিবীর বুকে নামে সন্ধ্যা। সূর্যের কাজের দায়িত্ব কে নেবে এই প্রশ্নের তখন কোনো উত্তর মেলে না। সূর্যের কাজের দায়িত্বভার নিতে কেউ এগিয়ে আসে না, কেবল ঘরের কোণে থাকা ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে পৃথিবীর অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করতে চায়।

পৃথিবীতে বসবাসকারী মানবসমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, যে যার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করে চলেছে। মোটকথা কর্মোদ্যোগে এগিয়ে আসার প্রবণতাই আসল ব্যাপার। শক্তির তারতম্য সত্ত্বেও সামাজিক কল্যাণকর্মে সাধ্যমতো আত্মনিয়োগই প্রতিটি মানুষের প্রধান কর্তব্য। মাটির প্রদীপের যোগ্যতা নিতান্তই সামান্য, ঝড়ঝঞ্ঝায় তার ক্ষীণ দীপশিখা যে-কোনো মুহূর্তে নিভে যেতে পারে তবু সে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করতে চায়। এভাবে দেখা যায় একসঙ্গে শত শত ক্ষীণ দীপশিখার সম্মিলিত আলোর মূল্য অসামান্য হয়ে ওঠে। সমাজে সূর্যের মতো প্রবল শক্তিধর মানুষের দেখা না মিললেও মাটির প্রদীপের মতো তথাকথিত সামান্য মানুষও সমবেত হয়ে মানুষের কল্যাণকাজে নেমে পড়লে সমাজের সব অন্ধকার মুছে গিয়ে আলোর শিখা জ্বলতে থাকবে। তাই প্রতিটি মানুষের উচিৎ ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর সমাজস্বার্থে নিজেকে নিয়োজিত করা।

২৯ দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটাকে রুখি
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?

▶▶ দরজা বন্ধ করে রেখে যদি ভ্রমের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়, তবে সত্যের অবাধ প্রবেশ ঘটবে কীভাবে। তার পথও তো অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে।

জীবনের অর্থ পথ চলা, আর সেই চলার পথে থাকে নানান অভিজ্ঞতার আনাগোনা। মানবজীবনে সত্য, মিথ্যা এবং ভ্রম নামক বস্তু আসে আর যায়। মানুষের মর্মের অন্তরে উঁকি দেয় সকল ভাবনা। অনেক সময় কঠিন কঠোর সত্যকে আড়াল করতে অথবা সত্যের সম্মুখে দাঁড়াতে ভীত হয়ে কেউ কেউ মনের দ্বার রুদ্ধ করে ভ্রমকেই সত্যের নাম দেয়। এ যেন নিজেকে নিজের ছলনা, কিন্তু সত্য, হোক সে যত কঠোর তবুও এর বৈশিষ্ট্য সর্বদা নিজের আত্মপ্রকাশ ঘটানো। তবুও মানবচিত্তের দুর্বলতায় মানুষ ভ্রমের আড়ালে সত্যের আত্মপ্রকাশকে বাধা দিতে চায়। কিন্তু মর্মদ্বার রুদ্ধ করলেও সত্য নিজের প্রকাশবৈশিষ্ট্যে অনড় হয়ে থাকে। সত্য তখন আপন আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে নেয়। আর সে কারণেই দুর্বলতাকে দূরীভূত করে সত্যের আলোকে সত্যকে আত্মপ্রকাশের পথ করে দিলে মানবমনের আঁধার দূরীভূত হয়, মানবজীবন প্রকৃত সার্থকতা লাভ করে। ভ্রমের মোহজালে আবদ্ধ মানুষেরা সত্যের প্রকৃত আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। আর সেই মোহজাল ছিন্ন হলে তবেই সত্যের তাৎপর্যে মানবমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

৩০ যা রাখি আমার তরে, মিছে তারে রাখি,
যা রাখি সবার তরে সেই শুধু রবে।

▶▶ শুধুমাত্র নিজের জন্য আমরা যা রাখি, তা রাখা অর্থহীন কারণ তা চিরকাল থাকে না, যা সকলের জন্য রাখা হয় তাই শুধু থেকে যায়।

মানুষ একদিন অরণ্যচারী, গুহাবাসী, বর্বর ছিল। সেদিন পশুর সঙ্গে তার তেমন কোনো প্রভেদ ছিল না। ধীরে ধীরে তারা উন্নত মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে সমাজ গড়ে তুলল, মানুষ ক্রমশ সভ্য সমাজবদ্ধ জীবে পরিণত হল। এই সমাজবদ্ধতার মূল ব্যাপার প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। অর্থাৎ যারা সমাজবদ্ধ জীব, তারা একের প্রয়োজনে তার পাশে দাঁড়াবে, তার সুখ-দুঃখের অংশীদার হবে। এই শর্তকে সামনে রেখে মানুষ ক্রমশ উন্নতির শিখরে উঠতে লাগল, আবার একইসঙ্গে ভুলতে লাগল তার উন্নতির প্রথম সোপানের শর্তগুলির কথা। উন্নত হবার পথে সে পরিত্যাগ করতে লাগল পরার্থপরতাকে। মানুষ ক্রমশ আত্মমগ্ন, স্বার্থপর হয়ে উঠল। পার্থিব বস্তুগত দিকটিকে মানুষ গুরুত্ব দিতে লাগল। জোর করে আঁকড়ে ধরে রাখলেই তা রাখা যায় না, অপর মানুষকে ভালোবেসে যে কাজ করা হয়, যেসব সৃষ্টিশীল কাজ সব মানুষের জন্য সৃষ্ট হয় — পৃথিবীতে শুধু সেটুকুই থাকে। মানুষ পৃথিবীতে এসেছে খালি হাতে, যাবেও খালি হাতেই, তার সংগৃহীত কিছুই সে সঙ্গে নিয়ে যাবে না। কিন্তু মানুষের জন্য তার রেখে যাওয়া সৃষ্টিসম্ভার তার মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরেও অক্ষয়-অমর হয়ে থাকবে, মৃত্যুঞ্জয়ী হবে সৃষ্টিকর্তাও। এই অমোঘ সত্যই জীবনের সারকথা।

৩১ বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়,
লভিব মুক্তির স্বাদ।

▶ বৈরাগ্যসাধনের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্তি কাঙ্ক্ষিত নয়। বরং সাধারণ মানুষের সঙ্গে শত বন্ধনের মধ্য দিয়ে মুক্তির স্বাদ লাভই তাঁর কাছে পরম কাঙ্ক্ষিত।

মানবজীবন জরা-ব্যাধি-মৃত্যু আকীর্ণ। তাই যুগ যুগ ধরে মুনি-ঋষি থেকে সাধকেরা মুক্তির জন্য কঠোর-কঠিন তপস্যায় নিরত থেকে এসেছেন। গিরিগুহায়, মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় নির্জনে নিজ নিজ আরাধ্য দেবতার আরাধনায় থেকেছেন নিমগ্ন। মানবতার পূজারি কবি মনে করেন মানুষের মধ্যেই ভগবানের উপস্থিতি— 'যত্র জীব, তত্র শিব'। ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের জন্য নির্জন ধর্মস্থান, অথবা গোপন গিরিগুহা নিষ্প্রয়োজন। সংসার বিবাগী হয়ে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণের মাধ্যমে মুক্তিলাভ কাম্য নয়। আর্ত, পীড়িত, অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারলে মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে শতসহস্র বন্ধনলাভের মধ্য দিয়েই মুক্তির স্বাদ লাভ করা যায়। জাগতিক তথা পার্থিব জীবনকে উপেক্ষা করে বন্ধনমুক্তি অর্থহীন। সংসারে অবস্থান করেও ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে মানবসেবায় নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ লাভ করার মধ্যেই নিহিত থাকে জীবনের সার্থকতা।

৩২ ভালো-মন্দ, সুখ-দুখ, অন্ধকার-আলো,
মনে হয়, সব নিয়ে এ ধরণি ভালো।

▶ ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ, অন্ধকার-আলো —ইত্যাদি বৈপরীত্যের সম্ভারে আমাদের পৃথিবী এবং তা নিয়েই পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকা। জীবন মানুষের কাছে আকর্ষণীয় সব কিছু নিয়েই। পৃথিবীতে এভাবেই চলে অনন্ত প্রাণের প্রবাহ।

যদি পৃথিবী কেবল ভালো, সুখ কিংবা আলো নিয়ে গড়া হত, তাহলে সবকিছু বড়ো বেশি একঘেয়ে মনে হত। আলোর মহিমা উপলব্ধি করাই যেত না যদি না তা অন্ধকারের অস্তিত্ব চিরে বিকশিত হত। দুঃখ আছে বলেই মানুষের জীবনে সুখ এত কাঙ্ক্ষিত, এত মধুর। জীবনে যদি দুঃখ না থাকত, তবে সুখের মর্ম অনাবিষ্কৃতই থেকে যেত। মন্দ আছে বলেই তো ভালোর এত কদর। জীবনে ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার আসে পর্যায়ক্রমিকভাবে। এক রাশ দুঃখ নিয়েও মানুষ সুখের আশায় বেঁচে থাকে। অন্ধকার থেকে আলোর পথে গিয়ে মানুষ খুঁজে পায় জীবনের অন্য অর্থ। আর ভালোমন্দ যাই আসুক তাকে জীবনের স্বাভাবিক ওঠাপড়া হিসেবে মেনে নিতে পারে মানুষ। তাই পৃথিবীতে দুঃখ, অন্ধকার, মন্দ এসব থাকলেও পাশাপাশি সুখ, আলো, ভালোর অস্তিত্বের কথা ভেবে মানুষ নিজেকে সান্ত্বনা জোগায়, ভালো থাকে।

৩৩ উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

▶ প্রকৃতিগত গুণ বিচার করে মানবসমাজে যে উত্তম, মধ্যম ও অধম তিন প্রকারের মানুষ পাওয়া যায় তার মধ্যে উত্তম ব্যক্তি অধমের সঙ্গেও নিশ্চিন্তে চলতে পারেন। কিন্তু মধ্যম কখনই যেমন অধমের সঙ্গেও মিশতে পারে না, তেমনি উত্তমের সঙ্গেও সে রাখে ব্যবধান।

মানুষের মানসিকতার গুণ বিচারে যে উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণি— তার মধ্যে উত্তমের স্থান সর্বোচ্চ, আর অধম সর্বনিম্ন, মধ্যমের অবস্থান দুয়ের মাঝে। সে উত্তমের ন্যায় মহানুভব নয়, আবার অধমের ন্যায় নিকৃষ্ট নয়। প্রকৃত উত্তম আত্মবিশ্বাসী, অধমের সংস্পর্শে অধম হওয়ার ভয় তার নেই। তাই সে নিশ্চিন্তে সবার সঙ্গে মিশতে পারে, এতে তার চরিত্রগৌরব বাড়ে। কিন্তু মধ্যম হীনম্মন্যতার কারণে একদিকে যেমন উত্তমের পাশে আসতে পারে না, অন্যদিকে হীন হওয়ার আশঙ্কায় অধমকেও দূরে সরিয়ে রাখে। উত্তমের কাছে স্বাগত সবাই, অধমের সংসর্গ তার গৌরবহানি না করে শ্রেষ্ঠত্বকেই প্রকাশ করে। বরং উত্তমের সংসর্গ অধমের অন্তর্জগতেই পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। উত্তমের এই চরিত্র মাহাত্ম্যই তাকে মধ্যমের থেকে শ্রেষ্ঠ করে তোলে।

৩৪ যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর আকাশে আঁকা
আমি ভালোবাসি মোর ধরণির
প্রজাপতিটির পাখা

▶ ইন্দ্রধনু যত বড়োই হোক তার অবস্থান সুদূর আকাশে। বরং ধরণির বুকে উড়তে থাকা প্রজাপতির রংবেরঙের পাখাটি মর্ত্যবাসীর অনেক কাছের, তাই অনেক বেশি উপভোগ্য।

মানুষ মাত্রেই সুন্দরের পূজারি। তবু সুন্দরের প্রতি অদম্য আকর্ষণে ধরাছোঁয়ার বাইরের জিনিসকে ভালোবেসে মানুষ তাকে পায় না,পায় কেবল বেদনা। মোহাবিস্ট, অসম্ভব জীবনের বাসনা নয় বরং মানুষের কাঙ্ক্ষিত হওয়া উচিত সেই জীবন যা তার সাধ্যের সীমার মধ্যে পড়ে। যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, নাগালবহির্ভূত জিনিসের পেছনে বৃথা না ছুটে মানুষের উচিত সেই বস্তুর কদর করা, যার অবস্থান তার ধরাছোঁয়ার গন্ডির মধ্যে, যা তার আপনার। একইভাবে নিকটবর্তী আপনজনকে ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ জ্ঞান করে পরের বাহ্যিক আড়ম্বরে ভুলে তার প্রতি অন্ধ আনুগত্য বা অনুরক্তি অর্থহীন। এই সহজলভ্য মর্ত্যসৌন্দর্যকে উপেক্ষা নয় বরং তাকে নিবিড়ভাবে জানা, অনুভব করার মধ্যেই থাকে প্রকৃত আনন্দের আস্বাদ। মানুষের আপনজন বা নিজের ধন, তা যদি পর বা পরের ধনের তুলনায় সামান্যও হয়, তবু তাকে ভালোবাসা, তাকে বরণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবজীবনের পরম সার্থকতা।

৩৫ মাটিতে যাঁদের ঠেকে না চরণ
মাটির মালিক তাঁহারাই হন।

▶ মাটিতে যাদের পা ঠেকে না, তারাই মাটির মালিকের পদ দখল করেন।

মাটির পৃথিবীতেই মানুষ তার বাসস্থান গড়ে তোলেন, মাটিই মানুষের খাদ্যের জোগান দেয় কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষ এই মাটির অধিকার লাভ করেন না। পৃথিবীতে সব মানুষ ফসল ফলান না, কিন্তু ফসলের অধিকার চান সকলেই। কোনো শ্রম না করেও ফসলের ভাগ পেতে আগ্রহী থাকেন একশ্রেণির মানুষ — যেন তারাই এর মালিক। মাটির পৃথিবীতে কোনো দানই নেই তাদের, তবুও তারাই মালিক। তারা সাধারণ মানুষকে শোষণ করেন, সেইসব মানুষের দেহের ঘাম-রক্তকে মাটিতে মিশিয়ে, তাদেরই শ্রমের দান আত্মসাৎ করেন। আর যারা মাটির বুকে আপন রক্তকে ঢেলে সোনার ফসল ফলান, মাটির পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলেন; তারাই হন সর্বস্বান্ত, তারাই মাটির অধিকার হারিয়ে কোনোক্রমে কালযাপন করেন। যে সকল গর্বোদ্ধত মানুষ মাটিকে কোনো সম্মান করেন না, মাটির পৃথিবীতে চরণ ফেলতে যাদের মানে লাগে— কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তারাই হন মাটির মালিক। অর্থাৎ তারা অর্থসম্পদে বলীয়ান হয়ে মাটির ওপরে আইনি অধিকার

স্থাপন করেন। অন্যদিকে যারা বহু কষ্টে জীবনযাপন করেও মাটিকে শস্যশ্যামলা করে তোলেন, যাদের অবদানেই ভরে ওঠে আপামর জনসাধারণের ক্ষুধাভাণ্ড, তারা অর্থের শক্তিতে পিছিয়ে থাকায় হারিয়ে ফেলেন মাটির অধিকার অথচ তাদেরই মাটির মালিক হবার কথা ছিল।

৩৬ চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর গায়ে।

▶▶ চাঁদের আলোয় বিশ্ব আলোকিত। চাঁদের গায়ে যে কালো দাগ দেখা যায়, সেই কালিমার জন্য তার আলোর স্নিগ্ধতা ব্যাহত হয় না। কলঙ্ক গৌণ, চাঁদের আসল পরিচয় নিহিত তার আলোর সৌন্দর্যে, মাধুর্যে।

মানবসমাজে মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের কীর্তির মধ্য দিয়ে। ব্যক্তিগত জীবনের সাময়িক ভ্রান্তি, দোষ-ত্রুটি, দুঃখবেদনাকে প্রাধান্য না দিয়ে জীবনব্যাপী মহৎ কাজের নিরিখে মানুষকে বিচার করলে সেটাই হবে প্রকৃত মূল্যায়ন। মানুষমাত্রই ভুলত্রুটির অধীন। মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম, অর্থাৎ মুনিঋষিদেরও মতিভ্রম হতে পারে। কিন্তু এর জন্য মানুষকে কলঙ্কিত করার আগে মানবকল্যাণকর কাজে তাঁর অবদানকে বিচার করতে হবে। বিপুল কীর্তির আলো সামান্য কলঙ্ক মুছে দেয়। মানবসেবায় ব্রতী মহান মানুষেরা অনেক দুঃখ-যন্ত্রণার পথ পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছোন। সমাজে একদল মানুষ আছে যারা মহৎ কীর্তিমান মহামানবদের জীবনকে কালিমালিপ্ত করতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু মানবতার ধর্মে মনুষ্যত্বের জয়গানে সেই মানুষেরা অনেক উচ্চ আসনে আসীন। তাই তাঁরা, তাঁদের প্রতি সমস্ত সমালোচনাকে তুচ্ছ করে উন্নত চিন্তা ও কর্মের আলোয় যুগে যুগে বিশ্বসংসারকে আলোকিত করে তোলে।

৩৭ শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ।

▶▶ শিশুর কাছে যেমন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, ভরসার স্থল তার মা, তেমনি একজন পরিণতমনস্ক মানুষ তার মননগত আশ্রয় হিসেবে নির্ভর করে থাকেন মাতৃভাষার ওপরে। তাই শিক্ষায় মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমতুল্য। শিশুর কাছে মাতৃদুগ্ধই যেমন একমাত্র পেয়, মাতৃস্তন্য পানেই শিশুর শরীর সুগঠিত হয়। অনুরূপে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের বিকাশ সুনিশ্চিত হয়। যে ভাষা-পরিবেশে শিশু বড়ো হয়ে ওঠে সেই ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষার সাহায্যে অর্জিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব হয়।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের রীতিনীতি ও সুস্থ-স্বাভাবিক পরিমণ্ডল বজায় রাখা মানুষের অন্যতম কর্তব্য। আর এই কর্তব্য সম্পাদনের যথাযথ মাধ্যম হল শিক্ষা। একজন মানুষের শিক্ষার সূচনা হয় তার গৃহপরিবেশ অর্থাৎ মাতৃভাষার পরিমণ্ডলে। এই পরিমণ্ডলের মাধ্যমেই মানুষের প্রথাগত বা সাধারণ শিক্ষা যাই হোক না কেন, তার ভিত তৈরি হয়। এই ভিতের ওপরেই নির্মিত হয় কোনো মানুষের আগামী শিক্ষা তথা উচ্চশিক্ষা। শিক্ষা মানুষের হাতিয়ার। শিক্ষাকে যথার্থভাবে বাহন করে তোলার জন্য প্রয়োজন যথার্থ আত্মীকরণ — আর তা একমাত্র সম্ভব মাতৃভাষায়।

৩৮ নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
"ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।"
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, "যাহা কিছু সুখ সকলি এপারে।"

▶▶ নদীর এপার নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে অন্য পারে সর্বসুখ রয়েছে বলে তার বিশ্বাস। আবার নদীর অন্য পারটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে যে, যাবতীয় সুখ রয়েছে অপর পারটিতেই।

মানুষের মনের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই হল কখনও নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট না হওয়া। মানুষ তাই কেবলই নিজের অবস্থা সম্পর্কে হতাশাবোধ করে এবং অন্যের অবস্থা বা জীবনযাপন সম্পর্কে ঈর্ষা বোধ করে। এর ফলে প্রতিনিয়ত তার নিজের মনে একধরনের যন্ত্রণা ও হীনম্মন্যতাবোধ তৈরি হয়, যা তাকে কখনোই সুখ, শান্তি বা আনন্দের অনুভূতি এনে দিতে পারে না। অপরের প্রতি এই ধরনের অসূয়া মানুষকে নানাভাবে একধরনের মানসিক দৈন্যে জর্জরিত করে, যা থেকে সে আর মুক্তি পায় না। একজন মানুষ যদি অন্যের জীবন বা অবস্থার সঙ্গে নিজের জীবনের চাওয়া-পাওয়ার তুলনা না করে কেবল নিজের জীবনের পাওয়াটুকু নিয়েই তৃপ্ত থাকে, তবে সে-ই যথার্থ সুখ ও শান্তির সন্ধান পেতে পারে। একই নদীর দুটি তীর যেন মানবজগতের অন্তর্গত দুটি ভিন্ন মানুষের জীবন। নদীর একদিকের তীর যখন মনে করে সমস্ত সুখ ও আনন্দ তার বিপরীত তীরেই রয়েছে, বিপরীত তীরও তখন একই ধারণা পোষণ করে এবং এর ফলে তাদের মনে কেবল অতৃপ্তি ও হতাশাই তৈরি হয়। প্রকৃত সুখ বা শান্তি নিহিত রয়েছে আত্মতৃপ্তির মধ্যে। অন্যকে ঈর্ষা করে হতাশাই বাড়বে, সুখ মিলবে না।

৩৯ শর ভাবে, ছুটে চলি, আমি তো স্বাধীন
ধনুকটা একঠাঁই বদ্ধ চিরদিন।
ধনু হেসে বলে, "তুমি জান না সে কথা
আমার অধীন জেনো তব স্বাধীনতা।"

▶▶ ধনুকের থেকে নিক্ষিপ্ত তির যখন ছুটে চলে তীব্রগতিতে তখন সে মনে করে সে স্বাধীন, সে ইচ্ছেমতো ছুটে চলতে পারে এবং তার গতির উৎস ধনুককে সে ভাবে একই জায়গায় থেমে থাকা জড়বস্তু। কিন্তু ধনুক জানে তীরের ছুটে চলা তার ওপরেই নির্ভরশীল। তীর যতই ধনুককে অবজ্ঞা করুক না কেন তার স্বাধীনতা ধনুকের অধীনেই।

বাস্তব সংসারেও আমরা দেখতে পাই কোনো কোনো মানুষ যখন সাফল্যের মধ্যগগনে বিরাজ করে বা উন্নতি ও খ্যাতির শীর্ষে বিরাজ করে তখন সে অসার অহংকারের বশবর্তী হয়ে পড়ে। সে ভুলে যায় তার এই সমৃদ্ধির পিছনে যাদের অবদান রয়েছে তাদের কথা। এমনকি প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের অহংকারে সে তার পৃষ্ঠপোষক বা প্রেরণাদাতাকে হীন ভাবতে ও তার নিন্দা করতেও পিছপা হয় না। সে নিজেকে স্বয়ংসিদ্ধ ভেবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার চেষ্টা করে সর্বদা। কিন্তু তার শ্রেষ্ঠত্ব বা সাফল্যের পেছনে যাদের ভূমিকা রয়েছে তারা জানে অহংকারীর পতন অনিবার্য। ঘুড়ি যতই আকাশে উড়ুক, লাটাইয়ের ভূমিকাকে অস্বীকার করা ধৃষ্টতারই নামান্তর। অতএব একটা সময়ে ঘুড়ির মতো তাকে নেমে আসতে হবেই। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই নিজেদের স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত এবং উপকারীর উপকার অস্বীকার না করে বা তাকে হীনদৃষ্টিতে না দেখে তাকে যোগ্য আসনেই বসানো উচিত।

৪০ কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে —
'আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কিরে।'
থলি বলে, 'কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে।'

▶▶ ভিক্ষার ঝুলি নিজে শূন্য থাকায় পূর্ণ টাকার থলিকে উভয়ের পূর্বের আত্মীয়তা ভোলার জন্য নিন্দা করে। কিন্তু ওই টাকার থলি শূন্য হয়ে যদি একদিন ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন হয়তো ভিক্ষার ঝুলিই আর টাকার থলিকে চিনতে পারবে না। অর্থের এমনই মহিমা। যখন যার ভাঁড়ারে প্রবেশ করে, সে তখন স্বার্থপর হয়ে যায়।

অর্থ-ই মানুষের বিভেদ-বৈষম্যের কারণ। তা-না হলে ধনী ও দরিদ্র মানুষ হিসেবে কেউই পৃথক নয়। মানুষে মানুষে বুদ্ধি, চরিত্র, শক্তি এবং জীবনদৃষ্টিতে পার্থক্য থাকতে পারে। আমরা সাম্যের আদর্শ ও মহিমা প্রচার করি। অথচ অর্থকৌলিন্যে, সামাজিক স্তরভেদে মানুষের মধ্যে কী প্রচণ্ড ব্যবধান। অর্থ যার আছে, সেই ধনীব্যক্তি দরিদ্র অর্থহীনকে মানুষ বলেই গণ্য করে না। যে মানুষ দারিদ্র্যে বিড়ম্বিত, ধনী আত্মীয় সম্বন্ধে তার ক্ষোভের অন্ত নেই। ধনীর সঙ্গে তার যে একটা সম্পর্ক আছে, সেই আত্মীয়তার কথা সে তাকে মনে করিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কোনোভাবে সে যদি ধনলাভ করে এবং তার ধনী আত্মীয়টি নির্ধন হয়ে পড়ে তখন সেও তাকে চিনতে অস্বীকার করে। জগতে সচরাচর এমন ঘটে থাকে।

৪১ দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

▶▶ দেবতাকে আমরা যা দিতে পারি তাই আমরা দিই প্রিয়জনকে। আবার প্রিয়জনকে যা দিতে চাই তাই দিই দেবতাকে। দেবতাকেই আমরা প্রিয়জন করে তুলি, প্রিয়জনকেই করি দেবতা।

মানুষ নিজের কল্পনায় দেবতার মূর্তি সৃষ্টি করে। সে মূর্তির সাথে মানুষের চেহারার মিল আছে। দেবতার মহিমাও মানুষেরই সৃষ্টি। অমৃতের সন্তান মানুষ। বিশ্বভুবনের সমস্ত জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়ে চলেছে। তবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান পরিচয় হল তার মনুষ্যত্ব। বলাবাহুল্য, বিশ্বদেবতার অস্তিত্বও নির্ভর করে মানুষের অস্তিত্বের ওপর। নারায়ণ নরের মধ্যেই বিরাজমান — সেই নারায়ণই যখন অপমানিত হন তখন সেই অপমান মানুষের জীবনকেও পর্যুদস্ত করে। পার্থিব জীবনের ভোগ-প্রাচুর্যের মধ্যে এক অজ্ঞাত অভাববোধ মানুষকে প্রতিনিয়ত সংকটে ফেলে। দুঃখ-দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষকে যেতে হলেও সৌন্দর্য, নিসর্গ ও মানবপ্রেমসাগরে অবগাহনেই জীবনের পরিপূর্ণতা। শান্তি, মৈত্রী ও ভালোবাসাপূর্ণ বিশ্বভুবন যথার্থ অর্থে স্বর্গীয় সুষমা লাভ করে। প্রিয়জনকে দেবতাজ্ঞানে ভালোবাসলেই আমাদের ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব।

৪২ আগা বলে, "আমি বড়, তুমি ছোটোলোক।"
গোড়া হেসে বলে, "তাই ভালো তাই হোক।
তুমি উচ্চ আছ বলে গর্ব আছে ভোর,
তোমারে করেছি উচ্চ এই গর্ব মোর।"

▶▶ গোড়ার ওপর ভর করে আগা উচ্চে বিরাজ করে বলে সকলের সম্মুখে সে-ই শুধু প্রকাশিত। তাই তার অহংবোধের অন্ত নেই। অহংকারের আতিশয্যে সে গোড়ার অবদানের কথা অস্বীকার করে, তাকে ছোটোলোক বলে উপহাস ও উপেক্ষা করে। কিন্তু গোড়া আপন ঔদার্যে অমলিন বলেই আগার এই ক্ষমাহীন ঔদ্ধত্যকেও হাসিমুখে স্বীকার করে নেয় এবং আগাকে উচ্চে তুলে ধরার নীরব গৌরবে গৌরবান্বিত হয়।

আমাদের সমাজেও আগার ন্যায় আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ কিছু অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি আছে। এরা সর্বদা পরিশ্রমী মানুষের অক্লান্ত শ্রমদানের ফসল নিজের গোলায় তোলে, তার দৌলতে নিজেদের বড়োলোক বলে দাবি করে এবং প্রবল আত্মপ্রচারে মত্ত হয়। এরা কখনও স্বীকার করে না তাদের নিজেদের সমৃদ্ধির নেপথ্যে থাকা চিরবঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের অতুলনীয় অবদানের কথা। কিন্তু অবহেলার অন্ধকারে থাকা গোড়া অর্থাৎ সভ্যতার পিলসুজরূপী কর্মী মানুষেরা উচ্চবিত্তদের সমস্ত অবজ্ঞা হাসিমুখে মেনে নেয়। তারা বোঝে সমাজ-সভ্যতার রথচক্রকে সচল রেখে সকলের মুখে হাসি ফোটানোর মহত্ত্ব, বোঝে স্বদেশের উন্নত, সমৃদ্ধ সমাজসৌধের বুনিয়াদ হয়ে থাকার গুরুত্ব।

৪৩ হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি —
ধরিতে দরিদ্রবেশ।

▶▶ ভারতবর্ষের আবহমানকালের শিক্ষাই হল ঐশ্বর্যের মায়াবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ। ভারতবর্ষ তার আপন গুণে মহান রাজাদের ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে, বুঝিয়েছে রাজমুকুট, রাজসিংহাসন, রাজঐশ্বর্য— সবই ক্ষণিকের, শিখিয়েছে ত্যাগের মধ্যে আছে আনন্দের রসদ।

ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত রাজারা সর্বত্যাগী হয়ে ত্যাগের মহান আদর্শকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। রাজা হরিশচন্দ্র সর্বত্যাগী মহারাজ, রাজা রামচন্দ্র প্রজাপালক, সম্রাট অশোক প্রজাহিতৈষী। এইভাবে পুরাণ, ইতিহাস ঘাঁটলে বহু রাজার পরিচয় আমরা পাব, যাঁরা রাজসিংহাসন, রাজঐশ্বর্যের মায়া পরিত্যাগ করে দরিদ্রবেশ ধারণ করে প্রজাপালকরূপে আজও অমর হয়ে আছেন। তাঁরা জানতেন, মনোরাজ্যের রাজা হতে পারলে বিশ্বের রাজত্বের অধিকারী হওয়া যায়। সর্বত্যাগী হয়ে প্রজাদের সেবার মধ্য দিয়ে অন্তরে যে অনাবিল তৃপ্তি ও আনন্দের উল্লাস ঘটে, তাতেই তো ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। মহামতি অশোক মানবসেবার জন্য গড়ে তুলেছিলেন নানা প্রতিষ্ঠান, ভালোবেসেছিলেন সমস্ত মানুষকে, 'রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই' —এমন আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। কিন্তু ভারতবর্ষ এই মহান আদর্শের প্রবক্তা হয়েও কখনো-কখনো সেই আদর্শচ্যুত হয়েছে। তবে সঠিক পথে ফিরে এসে নিজেকে পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতেও সক্ষম হয়েছে।

৪৪ গুণবান যদি পরজন, গুণহীন
স্বজন; তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয়
পরঃ পরঃ সদা।

▶▶ জগৎসংসারে আপনজনই মানুষের কাছে প্রিয় বা শ্রেষ্ঠ হন, তা তিনি যতই নির্গুণ হোন-না কেন। পর কখনও আপনজনের চেয়ে বেশি আদরের হতে পারে না —যত গুণই তাঁর থাকুক। অর্থাৎ, যে-কোনো অবস্থাতেই পরের তুলনায় স্বজ্ঞাতি-স্বজাতি-স্বজন শ্রেয়।

গুণগত বিচারে আমরা সমাজে কখনো-কখনো গুণবান পরজন ও গুণহীন স্বজন — এই দুই শ্রেণির মানুষ প্রত্যক্ষ করি। গুণবানেরা বিবিধ গুণের কারণে সমাজ কর্তৃক শ্রদ্ধা-সম্মান লাভ করেন, অপরদিকে নির্গুণরা গুণহীনতার কারণে তা থেকে বঞ্চিত থাকেন। কিন্তু গুণবানের যতই গুণ থাকুক না কেন, যতই তিনি শ্রদ্ধা-সম্মান পান-না কেন, তবু তিনি যদি পরজন হন, তবে তিনি কখনোই শ্রেয় হতে পারেন না। কারণ পর কখনও আপন হয় না, বিপদে-আপদে ওই গুণবান পরজনের সাক্ষাৎ মেলে না। গুণবান স্বজন আমরা সকলেই আকাঙ্ক্ষা করি, কিন্তু যদি স্বজন কখনও গুণহীনও হন, তবুও তিনি শ্রেয়, কারণ তিনি আপনজন। গুণহীনতার কারণে সকলের দ্বারা তিনি অবহেলিত, তবু তিনি আপনজনের পাশে সবসময় থাকেন। তাই অপরের দ্বারা অবহেলিত স্বজন গুণহীনরাই শ্রেয় ব্যক্তি, যেহেতু তিনি স্বজাতি, স্বজ্ঞাতি, স্বজনকে কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করেন না।

৪৫ ছোটো ছোটো বালুকণা, বিন্দু-বিন্দু জল
গড়ি তোলে মহাদেশ, সাগর অতল।

▶▶ এক-একটি বালির কণা জমে জমে স্তূপের সৃষ্টি হয়। ক্রমশ সেই স্তূপীকৃত বালুকারাশি ভূমিখণ্ডের নবরূপ পরিগ্রহ করে নতুন কোনো মহাদেশের সৃষ্টি করে থাকে। তেমনিভাবে এক-এক ফোঁটা জল জমে জমে জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। তারপর সেই জলাশয়ে আরও জলবিন্দু জমতে জমতে অথই জলরাশি মহাসাগরের রূপ নেয়।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজেই তার ওঠা-বসা, সমাজই তার সাধনার স্থল। একটি সম্পূর্ণ মানুষের মধ্যে আছে দুটি সত্তা— একটি হিসাবি সত্তা অন্যটি হিসাবহীন। হিসাবি সত্তা সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে সমাজনীতি—বাস্তবতার পথ নির্দেশ। আমাদের বাস্তব জীবনেও আমরা দেখি যে— সঞ্চয়ী মনোভাব থেকেই ব্যক্তি মিতব্যয়ী হয়ে এক-একটি পয়সা জমিয়ে একদিন প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। আর এই অর্থ দিয়ে কল্যাণমূলক কর্ম সম্পাদনেই হয়েছেন সমাজেরই এক-একজন স্মরণীয় মানুষ।

অন্যদিকে কবি-দার্শনিক-মনীষীরা বলেন— "বড়ো যদি হতে চাও ছোটো হও আগে"। ছোটো থেকেই পড়াশোনার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন, সঠিক জীবনযাপন ও আদর্শ জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে পার হলে তবেই প্রকৃতপক্ষে ওই মহাদেশ ও মহাসাগরের মতো বড়ো হওয়া সম্ভব। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে শুরু করলেও যদি লক্ষ্যে স্থির থাকা যায় তাহলে একদিন-না-একদিন ঠিক চাঁদের পাহাড়ে পৌঁছোনো সম্ভব।

৪৬ দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

▶▶ দণ্ডদাতা দণ্ডিতকে দণ্ডদানের সময় যখন চোখের জল ফেলেন, তখন সেই বিচারই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

সব সমাজেরই নিজেদের মতো করে কিছু নিয়ম বিধি রয়েছে। তেমনি আছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই বিধিভঙ্গের ঘটনা। সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত বিধিভঙ্গকারীদের জন্য সব দেশ-কালের সমাজেই দণ্ডবিধানের প্রচলনও প্রথম থেকেই। অপরাধীকে শাস্তিপ্রদানের ক্ষেত্রে হয়তো প্রাথমিকভাবে উদ্দেশ্য ছিল দুষ্টের দমন, অন্যান্য অপরাধপ্রবণ মানুষের মনে ভীতিসঞ্চার, যাতে বিশৃঙ্খলা না আসে। অপরাধীকে এক্ষেত্রে কেবলমাত্র অপরাধী হিসেবেই দেখা হত— যেন এই তার প্রথম ও শেষ পরিচয়। তার সমগ্র মানবিক সত্তাটিকে অগ্রাহ্য করা হত। কিন্তু মানবতাবাদী দৃষ্টিতে অপরাধীর মনের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব বলেই বিশ্বাস করা হয়। শাস্তিদানের প্রধান উদ্দেশ্যই সেটা। অপরাধী তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপে, অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়ে এক সময় প্রকৃত মনুষ্যত্বে উত্তরিত হবে, এই সংশোধনের দিকেই দণ্ডদাতার লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর এজন্যে দণ্ডদাতা বিচারককে সহানুভূতির সঙ্গে দণ্ডিতের সমব্যথী হয়ে উঠতে হবে। শুধুমাত্র শাস্তিদানের জন্য শাস্তিদানের যান্ত্রিকতাকে ত্যাগ না করলে বিচার প্রহসনে পরিণত হয়। দণ্ডবিধানের প্রকৃত সার্থকতা মনুষ্যত্ববোধের বিকাশে—বিচারকের সমবেদনায় ভাস্বর সে বিচারই শ্রেষ্ঠ বিচার।

৪৭ মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে।

▶▶ আকাশে মেঘ দেখে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। মেঘের আড়ালেই রয়েছে সূর্যের আলোকরশ্মি।

ঘন কালো মেঘ সূর্যকে ঢেকে দিয়ে অন্ধকার করে দেয় চরাচর। ভয়াবহ দুর্যোগ আর বিপদের পূর্বাভাস বয়ে নিয়ে আসে। ভীতির সঞ্চার ঘটায়। কিন্তু তাতে সূর্য ক্ষণিকের জন্য ঢাকা পড়েছে মাত্র—এই বোধ মানুষকে আশ্বস্ত করে। মানুষের জীবনপ্রবাহেও প্রাকৃতিক এই সত্য প্রতিবিম্বিত হয়। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ আর সুখের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত হয় না। জন্ম থেকে মৃত্যুর মাঝখানে প্রতিটি মানুষকে অনেক ব্যর্থতা, হতাশা, প্রতিবন্ধকতার সামনে দাঁড়াতে হয়। অনেক অপ্রাপ্তি, আর দুঃখবোধ মানুষের জীবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে। মনে হয়, যেন দুঃখকষ্টের এই অভিজ্ঞতাই চরম সত্য। সুখ-শান্তি জীবনে শুধু দুর্লভ নয়, অলভ্য— নৈরাশ্যবাদী এই মানসিকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে মনে রাখা দরকার অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়, সে কেবল আলোকে সাময়িকভাবে সরিয়ে রেখেছে মাত্র। ব্যর্থতার অপর পিঠেই আছে সফলতা। দুঃখ আসলে সুখকে গভীরভাবে উপলব্ধি করারই প্রস্তুতি। বিপদ, প্রতিকূলতা, ভয় এসবই মানব-অভিজ্ঞতায় জরুরি। ধৈর্য ও সাহসের পরীক্ষা দিয়ে জীবনপথের বাধাকে অতিক্রম করতে পারলে তাতেই মানুষ সুখ-সফলতার আনন্দকে পূর্ণমাত্রায় অনুভব করতে পারবে।

৪৮ আমি ভয় করব না, ভয় করব না
দু-বেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না।

পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক-না কেন, ভয় পাওয়া উচিত নয়। আত্মশক্তিকে হাতিয়ার করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা উচিত।

ভয় এক তীব্র ব্যক্তিগত অনুভূতি। ভয়ের অবস্থান মানুষের মনে। ভয়ের অনুভূতি জড়িয়ে থাকে ভবিষ্যৎকল্পনার সঙ্গে। মানুষ যেমনটি হয়ে উঠতে চায়, যেমনভাবে বেঁচে থাকতে চায়—তার সেই চাওয়ার বিরুদ্ধে যেসব বাধাবিপত্তি-প্রতিকূলতা—তারাই ভয়ের জন্ম দেয়। তার বেঁচে থাকার ইচ্ছের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো প্রতিকূলতা হল মৃত্যু। মৃত্যুভয় তাই সবথেকে বড়ো ভীতির জন্ম দেয় মানুষের মনে। ভীতিই মানুষের সবথেকে বড়ো শত্রু। কারণ ভীতি মানুষকে নিশ্চেষ্ট করে রাখে। দুর্বল ও কাপুরুষ মানুষদের, বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে জয় করে নিজেদের ইচ্ছা, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা হয়ে ওঠে না। তাদের প্রতিটি ইচ্ছার তিলে তিলে মৃত্যু হয়। দৈহিক মৃত্যুর আগেই প্রতিদিন অসংখ্যবার মৃত্যুর অনুভব ঘটে তাদের। আর যাঁরা সাহসী তাঁরাও কিন্তু ভয়ের অনুভূতিহীন নন। কিন্তু তাঁরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রেখে ওই ভয়কে অতিক্রম করে যান। প্রবল সক্রিয়তায় সমস্ত বাধা-বিরোধকে ব্যর্থ করে জীবনকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চালাতে সাফল্য লাভ করেন। স্বপ্নকে সত্যি করে তোলেন। আত্মশক্তির উদ্‌বোধনে, ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশে তাঁরা সত্যিকারের এক বেঁচে থাকা-কে উপভোগ করেন প্রতিমুহূর্তে।